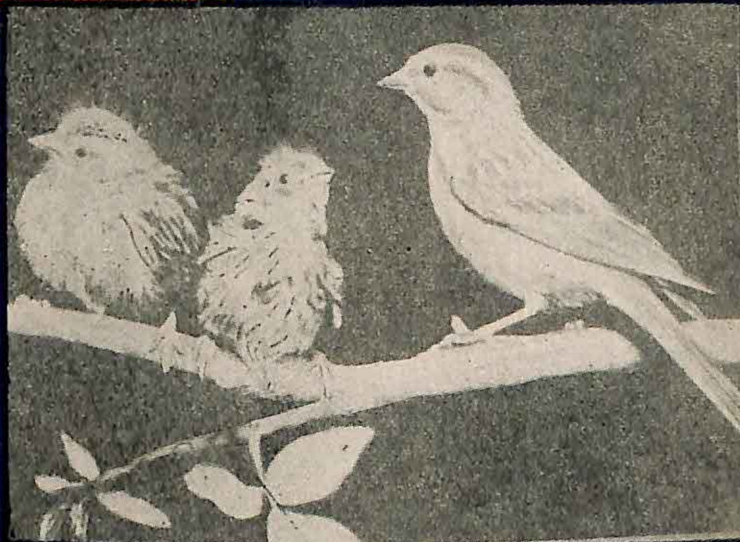
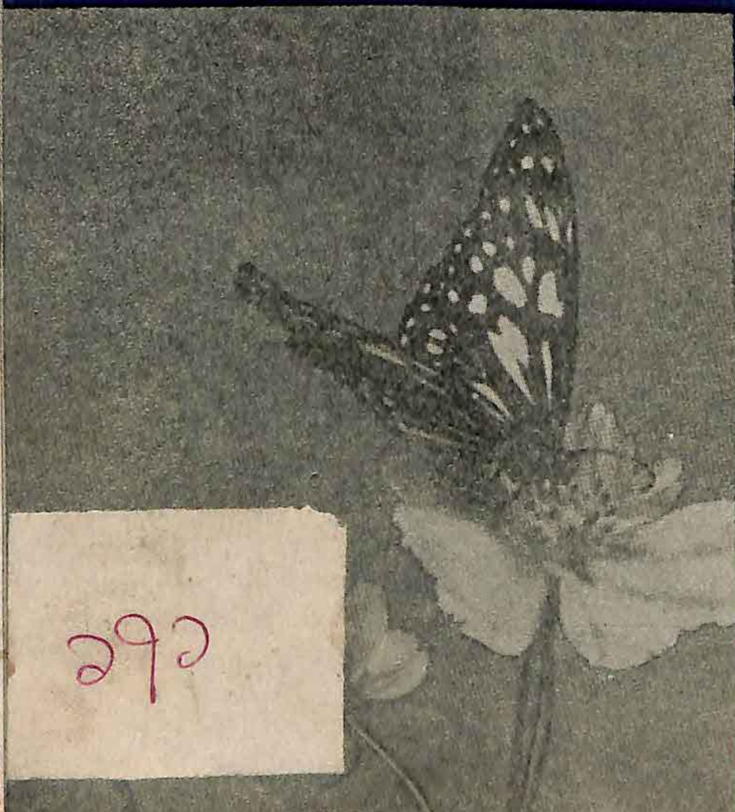
দেখে শেখ









মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

দেখে শেখ

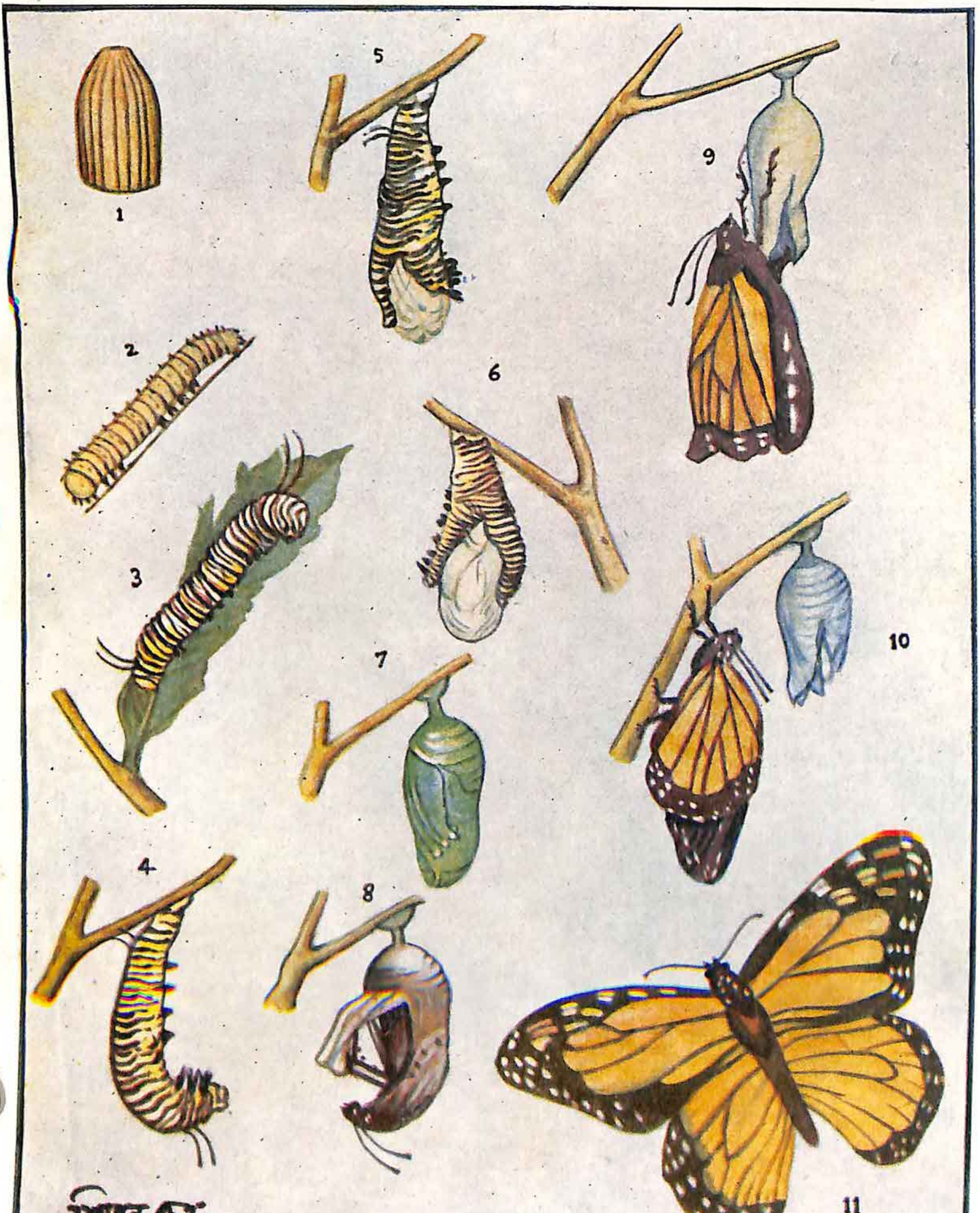
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, এম্. এস্-সি., ডি.ফিল্.
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।

এতে আছে—



[শিল্পী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ]

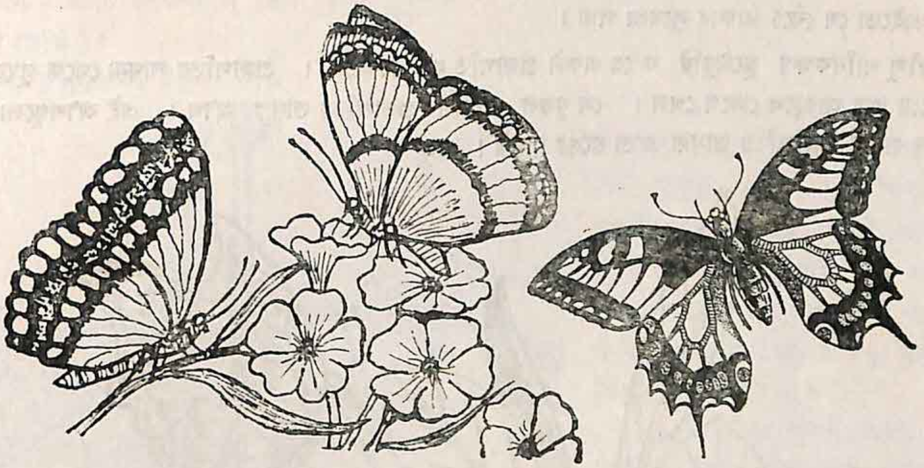
ফুলের বনে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির আনাগোনা !



প্রজাপতির জীবনকথা–ডিম থেকে জন্ম এবং ক্রমবিকাশ

প্রজাপতি

শীতের সকাল। দীপু বাগানে গিয়ে দেখল, সেখানে গাছগাছালির মধ্যে সবুজের মেলায় কত বিচিত্র বর্ণের ফুল। আর ফুলের বনে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির আনাগোনা! কী সুন্দর এই প্রজাপতি! নানা রকম নক্সা-আঁকা চিত্র-বিচিত্র পাখা নেড়ে নেড়ে ফুলের বনে ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কোনটা ফুলের বুকে আলগোছে বসে পড়ে। ফুলটা চমকে দুলে ওঠে। প্রজাপতি মধু লুটে ডানা মেলে উড়ে যায়। আবার আর এক ফুলে গিয়ে বসে। এদের বিচিত্র লীলা দেখে দীপু মুগ্ধ হয়ে গেল।



দীপু দেখল, ফুলের বনে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির আনাগোনা।

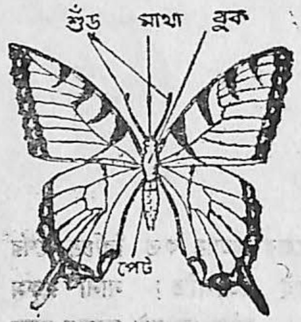
দীপু লক্ষ্য ক'রল, প্রজাপতি যখন কোথাও বসে, তখন ডানাগুলো মুড়ে পিঠের ওপর খাড়াভাবে তুলে দেয়, নৌকার পালের মতো ক'রে। এ সময় ডানার নীচের দিকটা দেখা যায়। দীপু অবাক হয়ে দেখল, ডানার নীচের দিকটায় কিন্তু এতো রঙের বাহার নেই। এর কারণ কী? দীপুর হঠাৎ মনে পড়ল, সে বইয়ে পড়েছে, বসে থাকা প্রজাপতির মুড়ে রাখা ডানার নক্সা ও রং প্রায়ই এমন হয় যে, সে অনায়াসে গাছের পাতা বা ফুলের সঙ্গে একেবারে

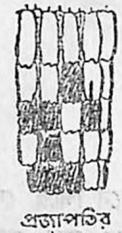
← রঙীন চিত্র (চিত্র-পরিচিতি):

প্রজাপতির জীবনকথা—ডিম থেকে জন্ম এবং ক্রমবিকাশ।

1. ডিম (বিবর্ধিত)। 2. সদ্যোজাত শুঁয়োপোকা বা শূককীট (বিবর্ধিত)। 3. পূর্ণবয়স্ক শুঁয়োপোকা বা শূককীট। 4. পিউপা বা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে, শুঁয়োপোকা পেছনের পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে ঝুলে রয়েছে। 5. পিউপা বা পুত্তলি সবেমাত্র খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে। 6. পিউপা বা পুত্তলি তার পুরাতন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। 7. পিউপা বা পুত্তলি। 8. পিউপা বা পুত্তলির আবরণ ভেঙে প্রজাপতি বেরিয়ে আসছে। 9. পিউপা বা পুত্তলি থেকে প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে, এবং ধীরে ধীরে তার ডানাগুলি প্রসারিত করছে। 10. প্রজাপতি তার ডানাগুলি প্রসারিত ক'রে তারপর শু'কিয়ে নিচ্ছে। 11. পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি—ডানা মেলে উড়ছে।

[শিল্পী—শ্রীশিবেন গুহ]







প্রজাপতির দেহ-গঠন। প্রজাপতির ডানার আঁশ। প্রজাপতির মাথা।

মিশে থাকতে পারে। এজন্য উড়তে উড়তে হঠাৎ কোথাও বসে পড়লে, তার শত্রু পাখিরা তাকে আর দেখতে পায় না। তাইতো সে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।

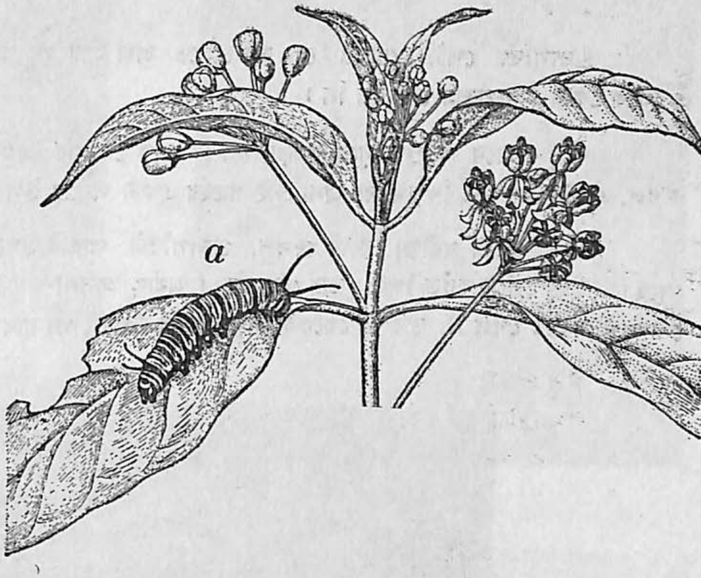
দীপু খানিকক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে একটা প্রজাপতি ধরে ফেললো। প্রজাপতির পাখনা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো রং উঠে গিয়ে তার আঙুলে লেগে গেল। সে বুঝল, এগুলো প্রজাপতির ডানার আঁশ। এই আঁশগুলো রঙীন, আর এগুলোর জন্যই প্রজাপতির ডানায় এতো রঙের বাহার!



1. দীপু লক্ষ্য ক'রল, একটা প্রজাপতি কিছুক্ষণের জন্য একটা পাতার উপর বসে রইল, তারপর উড়ে গেল।
2. দীপু লেন্স (অর্থাৎ, আতশী-কাচ)-এর সাহায্যে ডিমগুলি স্পষ্ট দেখতে পেল।

প্রজাপতিটা হাতে নিয়ে দীপু তার দেহের বিভিন্ন অংশ বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে লাগল। এরই নাম পর্যবেক্ষণ। সে দেখল, একটা ছোট গোল মাথা, একটা মাঝারি আকারের বুক, আর একটা সরু লম্বা পেট, এই তিনটি অংশ দিয়ে প্রজাপতির দেহটা তৈরী। মাথা থেকে দু'টো লম্বা শুঙ বা শুঁড় (অ্যান্টেনা) বেরিয়েছে। শুঁড়ের ডগা একটু মোটা। প্রজাপতি যে ফুল থেকে মধু খায়, সেই ফুলে এই শুঁড় ঠেকিয়ে, কি ফুল, কেমন তার মধু, এসবই সে বুঝতে পারে। শুঁড়ের ঠিক গোড়ায়ই দু'টো বেশ বড় বড় চোখ (পুঞ্জাক্ষি—অর্থাৎ অনেকগুলি ছোট ছোট চোখের সমষ্টি)।

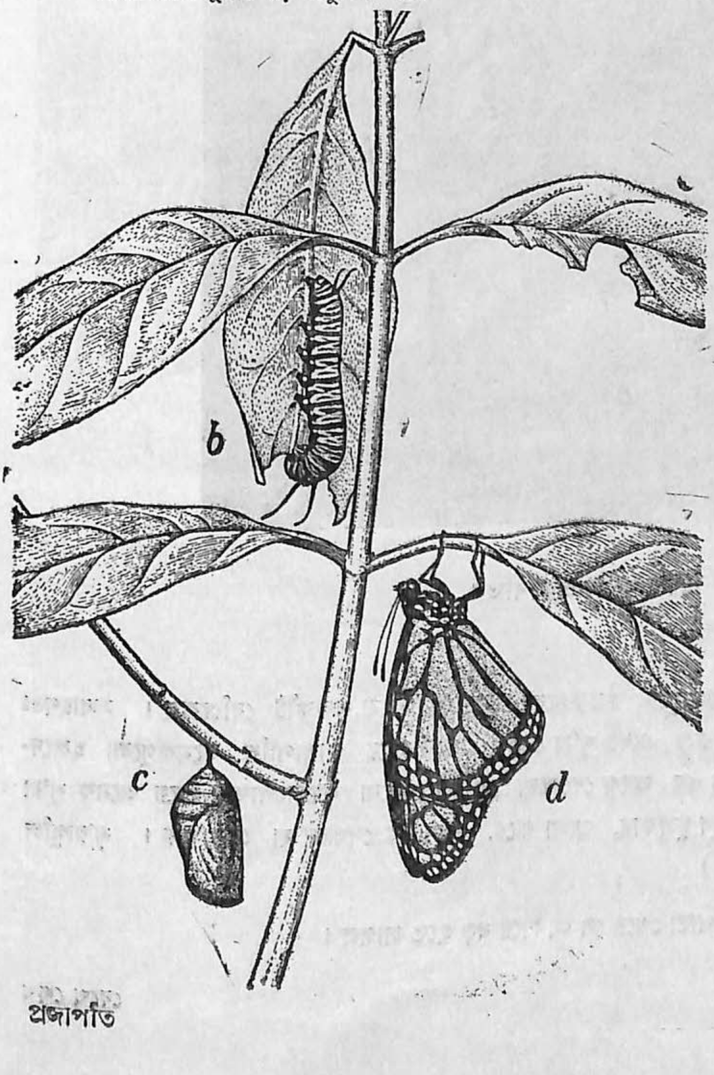
প্রজাপতির মুখটা বড় অদ্ভুত। তার



a—শুঁয়োপোকা।

চোয়ালগুলো জুড়ে গিয়ে একটা বেশ বড় নল তৈরী হয়েছে। এই নলটা কিন্তু গুটানো থাকে। খাবার সময়, সে এই নলটা সোজা ক'রে ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, এবং বেশ আরাম ক'রে ফুলের মধু চুষে খায়। এ জন্যই প্রজাপতি ফুলের মধু ছাড়া আর কিছুই খেতে পারে না।

প্রজাপতির বুকটা লম্বায় মাঝারি আকারের, কিন্তু এটাই তার দেহের মধ্যে সবচেয়ে চওড়া অংশ। অন্যান্য পতঙ্গের মতো প্রজাপতিরও ছ'টা পা। প্রত্যেক পা কতকগুলো খণ্ড দিয়ে তৈরী। বুকের নীচের দিক থেকে তিন জোড়া পা আর পিঠের দিক থেকে দু'জোড়া ডানা বেরিয়েছে। ডানাগুলো বেশ লম্বা আর চওড়া। তা'তে নানা রকম রঙের বাহার। তাই প্রজাপতি যখন উড়ে বেড়ায়, তখন মনে হয়, এক-একটি রঙীন ফুল যেন হাওয়ায়-হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।



b—শুঁয়োপোকা—পিউপা বা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে

c—পিউপা বা পুত্তলি।

d—পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি।

প্রজাপতির পেটটা দেহের মধ্যে সব চাইতে লম্বা আর সরু অংশ। এই পেট কয়েকটা খণ্ড দিয়ে তৈরী। এ থেকে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের হয় নি।

দীপু বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এক কোনায় একটা আকন্দ গাছ ছিল। দীপু হঠাৎ লক্ষ্য ক'রল, একটা প্রজাপতি কিছুক্ষণের জন্য সেই গাছের একটা পাতার উপর বসে রইল, তারপর উড়ে গেল।

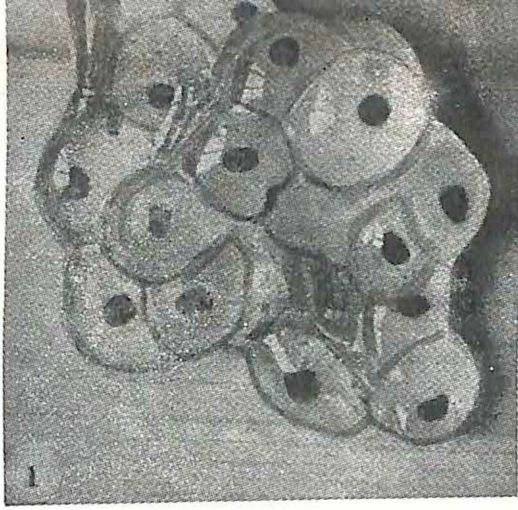
দীপু পাতাটা পরীক্ষা ক'রে দেখল, প্রজাপতিটা পাতার উপরে ছোট ছোট কতকগুলি ডিম পেড়ে রেখে গেছে। দীপু দৌড়ে বাড়ি গিয়ে তার লেন্সটা (অর্থাৎ, আতশী-কাচটা) নিয়ে এলো। এর সাহায্যে ডিমগুলি সে স্পষ্ট দেখতে পেল। তারপর থেকেই সে পাতাটার উপর লক্ষ্য রাখল।

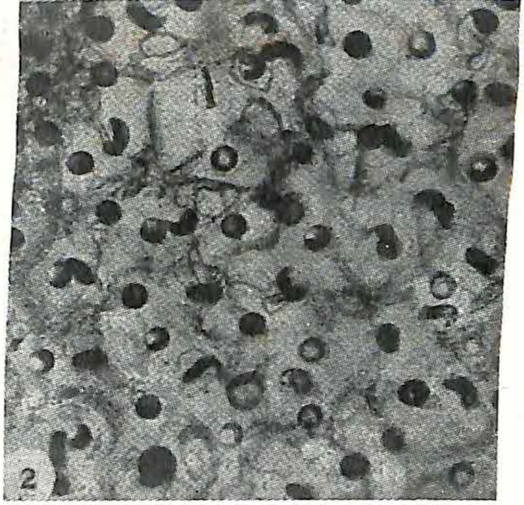


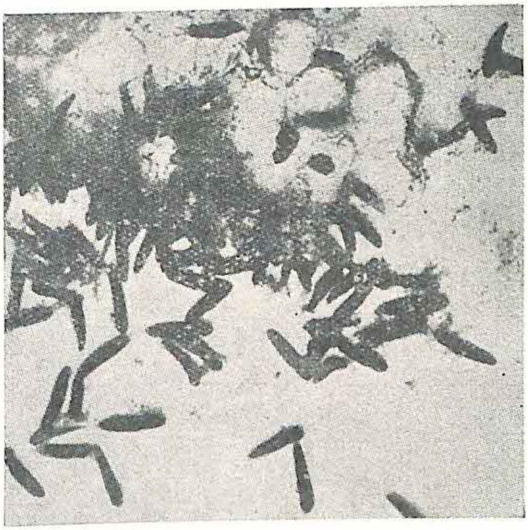
একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি।

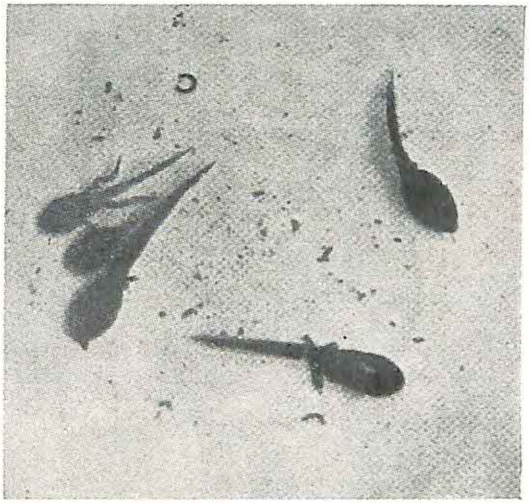
কয়েকদিন পরে দেখা গেল, ডিম ফুটে কতকগুলো শুঁয়োপোকা বা শূককীট বেরিয়েছে। সাধারণতঃ শুঁয়োপোকার গায়ে অনেক শুঁয়া থাকে, কিন্তু এদের শুঁয়া নেই। তবে গায়ে পাশাপাশি অনেকগুলো হলদে-কালো রঙের ডোরা-কাটা রয়েছে। (দীপু এর আগে দেখেছে, কোনো কোনো শুঁয়োপোকার গায়ে অনেক শুঁয়া থাকে। আর সেই শুঁয়া গায়ে লাগলে, খুব চুলকায়, জ্বালা করে, এমন কি সেখানে ঘা হয়ে যায়। শুঁয়াগুলি হ'ল শুঁয়োপোকার আত্মরক্ষার অস্ত্র-বিশেষ।)

শুঁয়োপোকা খুব পেটুক। কাঁচ পাতা খেয়ে সে আকারে বড় হতে লাগল।











ব্যাঙের জীবনকথা ।

1. ব্যাঙের ডিম—মাঝে কুসুম, এবং তার চারদিকে জেলীর মতো আবরণ দ্রষ্টব্য ।

2. ব্যাঙাচির জন্মের প্রথম লগ্ন—
কুসুমের পরিবর্তন, সেই সঙ্গে বাইরের জেলীর মতো পদার্থের অবশোষণ লক্ষ্যণীয় ।

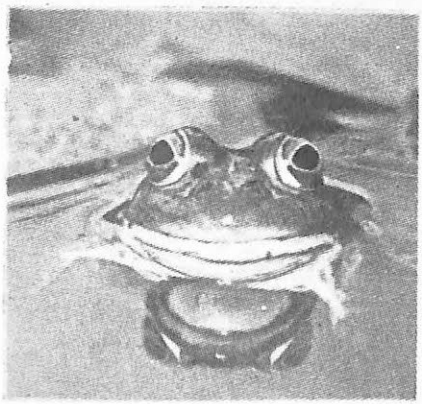
3. সদ্যোজাত ব্যাঙাচি ।

4. ব্যাঙাচি (পরবর্তী অবস্থা)—
প্রথমে দেখতে অনেকটা মাছের মতো থাকে, বড় মাথা এবং লম্বা লেজ । তারপর পেছনের দু'টো পা গজায় ।

5. ব্যাঙাচি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়েছে ।



একটা সোনা ব্যাঙের কাছে যেতেই, সে
বিরাট এক লাফ মেরে ঝপাং ক'রে
জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।



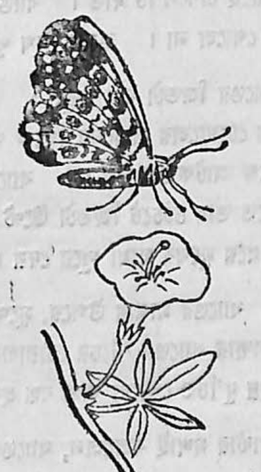
তারপর ডুব-সাঁতার দিয়ে খানিক দূরে
গিয়ে ভেসে উঠল, আর তার দিকে
ড্যাব-ড্যাব ক'রে চেয়ে রইলো।

আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল, শুঁয়োপোকা খাওয়া বন্ধ ক'রে চুপচাপ এক জায়গায় বসে রয়েছে ; তারপর লালা দিয়ে পাতার গায়ে ছোট একটা বোঁটা তৈরি ক'রে ঝুলে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই তার ঘাড়ের দিকের চামড়া লম্বালম্বিভাবে ফেটে গেল, আর সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো কুলের বিচির মতো একটা জিনিস। এর নাম পিউপা। এর রং ক্রমশঃ সবুজ হ'ল, আর তার গায়ে দেখা দিল কতকগুলো সুন্দর সুন্দর সোনালী রঙের ফুটকি। সাধারণতঃ একেই প্রজাপতির পিউপা বা পুত্তলি বলা হয়।

প্রায় দশ-বারো দিন পরে, এর পিঠের দিকের চামড়া ফেটে গেল এবং ধীরে ধীরে সেখান দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে এলো। প্রজাপতিটি ধীরে ধীরে তার ডানাগুলি প্রসারিত ক'রে তারপর শুকিয়ে নিল। এইভাবে খানিকক্ষণ সে বিশ্রাম ক'রল, তারপর এক সময় ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল।

সেদিনের সেই কুৎসিত শুঁয়োপোকাটি দেখে দীপু একবারও ভাবতে পারেনি যে, তার এমন রূপান্তর ঘটবে। তা থেকে বেরিয়ে আসবে এমন চিত্র-বিচিত্র সুষমামণ্ডিত ডানাওয়ালা প্রজাপতি! এসব দেখে দীপু খুবই অবাক হয়ে গেল, একথা সত্যি, কিন্তু এ থেকেই সে জানতে পারল প্রজাপতির এই অদ্ভুত জীবন-কাহিনী।

দীপুর আবার মনে হ'ল,—বাঃ! কী সুন্দর এই প্রজাপতি! এই জন্যই তো কবিরা একে নিয়ে কবিতা লেখেন, শিল্পীরা তার ছবি এঁকে আনন্দ পান, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, প্রজাপতি ধরার জন্যে, গাছপালার মধ্যে এতো ছুটোছুটি করে!



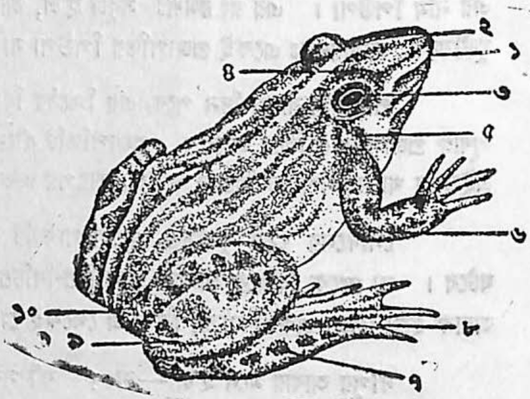
সোনা ব্যাঙ

একদিন হঠাৎ রাতভোর খুব বৃষ্টি হ'ল। পরদিন ভোরবেলা ডোবার ধারে গিয়ে ভানু দেখল, ডোবাটার চারপাশে সার বেঁধে অনেক হলুদ হলুদ ব্যাঙ বসে আছে, আর 'ক্যাঁ-কোঁ' শব্দ করছে। এগুলি সোনা ব্যাঙ।

একটা সোনা ব্যাঙের কাছে যেতেই সে বিরাট এক লাফ মেরে ঝপাং ক'রে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল, তারপর ডুব-সাঁতার দিয়ে খানিক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল, আর তার দিকে ড্যাব-ড্যাব ক'রে চেয়ে রইল।

ভানু এদের দেখে, বই পড়ে, আর মাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা ক'রে অনেক কিছু জানতে পারল।

সোনা ব্যাঙের গা মসৃণ, পিঠের দিকে হলদের উপরে কালো (বা, গাঢ় সবুজ) ডোরা। ব্যাঙের ঘাড় নেই, মাথা আর দেহ যেন একসঙ্গে মিশে গেছে।



সোনা ব্যাঙের বহিরাকৃতি।
১. মুখ-ছিদ্র ; ২. বহিঃনাসারন্ধ্র ; ৩. চোখ ; ৪. মস্তক ; ৫. কানের পাতলা পর্দা ; ৬. অগ্রপদ ; ৭. পায়ের পাতা ; ৮. লিপ্তপদ ; ৯. পশ্চাৎপদ ; ১০. অবসারণী।

মাথার একেবারে সামনের দিকে বেশ বড় অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুখ। উপরের চোয়ালে আছে একপাটি দাঁত। ব্যাঙ একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া আর কোনো সময়ই মুখ খোলে না। কারণ, মুখ খুলে রেখে সে শ্বাস নিতে পারে না।

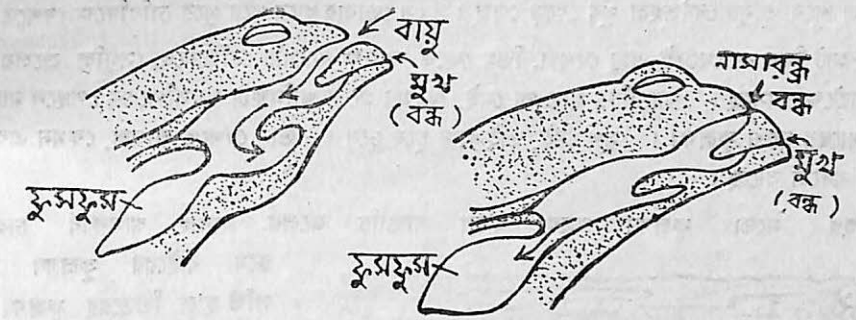
ব্যাঙের জিভটা বড় অদ্ভুত। এটাই তার শিকার ধরার অস্ত্র। জিভ চটচটে, আর নীচের চোয়ালের সামনের দিকে আটকানো থাকে। (আমাদের জিভের মতো পেছন দিকে আটকানো নয়।) ব্যাঙের মুখের সামনে কোনো কীট-পতঙ্গ এলে, ব্যাঙ চকিতে তার চটচটে জিভটা উল্টে বের ক'রে তাই দিয়ে বেশ দূরের সেই পতঙ্গটা চট্ ক'রে ধরে মুখের মধ্যে পুরে দেয়।

ব্যাঙের মাথার উপরে, মুখের ঠিক পিছনে, একজোড়া নাকের ছিদ্র আছে। জীবিত অবস্থায় ব্যাঙের নীচের চোয়ালটা ক্রমান্বয়ে ওঠানামা করে, আর সেই সঙ্গে নাকের ছিদ্র দু'টিও খোলে আর বন্ধ হয়। এর কারণ কী ?



ব্যাঙের শিকার ধরার পদ্ধতি।

মাষ্টার মশাই বললেন, ব্যাঙের শ্বাসকার্যের জন্যেই এরকম হয়। ব্যাঙ প্রথমে মুখ বন্ধ ক'রে, এবং নাকের কপাট খুলে রেখে, মুখ-বিবর ফোলায়। এর ফলে বাইরের বাতাস ব্যাঙের নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে প্রথমে মুখ-বিবরে আসে। এরপর নাক বন্ধ ক'রে মুখ-বিবর ছোট করলে, চাপের প্রভাবে, বাতাস ফুসফুসে চলে যায়। মুখ-বিবরে এবং ফুসফুসে অনেক রক্তবহা-নালী আছে, তাদের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেন রক্তে গৃহীত হয়, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এরপর বুকের পেশীর চাপে ফুসফুস সঙ্কুচিত হয়। তখন মুখ ও নাকের ছিদ্র



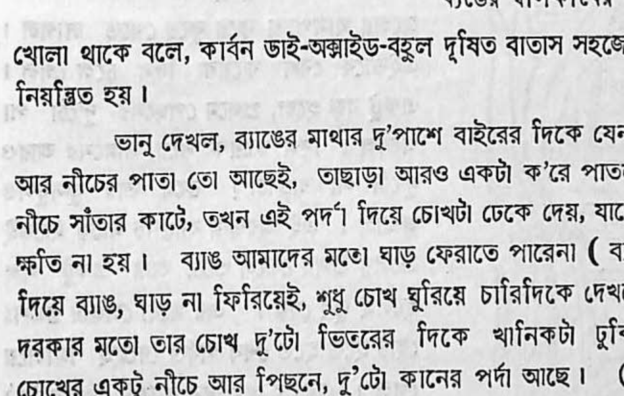
ব্যাঙের শ্বাসকার্যের পদ্ধতি।

খোলা থাকে বলে, কার্বন ডাই-অক্সাইড-বহুল দূষিত বাতাস সহজেই বাইরে চলে যায়। এইভাবে ব্যাঙের শ্বাসকার্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভানু দেখল, ব্যাঙের মাথার দু'পাশে বাইরের দিকে যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে দু'টি চোখ। চোখে উপরের আর নীচের পাতা তো আছেই, তাছাড়া আরও একটা ক'রে পাতলা স্বচ্ছ তৃতীয় পর্দাও আছে। ব্যাঙ যখন জলের নীচে সাঁতার কাটে, তখন এই পর্দা দিয়ে চোখটা ঢেকে দেয়, যাতে কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা লেগে চোখের কোনো ক্ষতি না হয়। ব্যাঙ আমাদের মতো ঘাড় ফেরাতে পারেনা (ব্যাঙের ঘাড়ই নেই), তাই এই ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দিয়ে ব্যাঙ, ঘাড় না ফিরিয়েই, শুধু চোখ ঘুরিয়ে চারিদিকে দেখতে পারে। আবার আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, ব্যাঙ দরকার মতো তার চোখ দু'টো ভিতরের দিকে খানিকটা ঢুকিয়ে নিতে পারে। মাথার শেষ প্রান্তে দু'পাশে, চোখের একটু নীচে আর পিছনে, দু'টো কানের পর্দা আছে। (আমাদের কানের পর্দা কর্ণনালীর ভিতরের দিকে থাকে, তাই বাইরে থেকে দেখা যায় না।)

ব্যাঙের ধড় থেকে বেরিয়েছে চারটি পা, পিছনের পা দু'টো বেশ বড় এবং শক্তিশালী। এজন্য দরকার হলে ব্যাঙ খুব জোরসে লাফ মারতে পারে। সামনের পায়ে চারটি ক'রে, আর পিছনের পায়ে পাঁচটি ক'রে, আঙুল থাকে। কোনো আঙুলেই কিন্তু নখ নেই। এরা পিছনের পা ভাঁজ ক'রে সামনের পায়ের উপর ভর দিয়ে বসে। আর পিছনের বড় বড় পায়ের সাহায্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ভানু এতদিনে বুঝলো, স্পোর্টসে ফ্রগ-রেসের সত্যিকার মানে।

ভানু লক্ষ্য ক'রল, ব্যাঙের পিছনের পায়ের আঙুলগুলি হাঁসের পায়ের আঙুলের মতো জোড়া (লিপ্তপদ) বলে এরা সহজেই জলে সাঁতার দিতে পারে। সাঁতার কাটার সময়ও ব্যাঙের পিছনের পা দু'টোই প্রধান ভূমিকা নেয়।



পুরুষ ব্যাঙ, গলার দু'দিকের থলি বেলুনের মতো ফুলিয়ে,
'ক্যাঁ-কোঁ' শব্দ ক'রে সঙ্গিনীদের গান শোনায়।

মাস্টার মশাই আরও বললেন,—পুরুষ ব্যাঙের গলার দু'দিকে স্বরযন্ত্রের থলি আছে। পুরুষ ব্যাঙ, গলার দু'দিকের থলি বেলুনের মতো ফুলিয়ে, 'ক্যাঁ-কোঁ' শব্দ ক'রে সঙ্গিনীদের গান শোনায়। এই সময় স্ত্রী-ব্যাঙ জলের মধ্যে ডিম পাড়ে।

একথা শুনে ভানুর কৌতূহল খুব বেড়ে গেল। সে ডোবার ধারে ঘুরে ঘুরে চারিদিকে দেখতে লাগল।

সাত-আট দিন না যেতেই ভানু দেখল, ডিম থেকে অনেক ব্যাঙাচি বেরিয়েছে, সেগুলি জলের মধ্যে গাছের পাতায় মাথা আটকে ভাসছে। ব্যাঙাচির হাত-পা নেই, ডিমের মতো খানিকটা মাংসপিণ্ডের পেছনে মাছের মতো লেজ, আর দু'পাশে মাছের মতো ফুলকা। মুখ নেই, তাই খায় চুষে চুষে। ভানু দেখতে লাগল, কেমন একটু একটু ক'রে ব্যাঙাচির রূপ বদলে যাচ্ছে।

মাছের মতো ফুলকা থাকে ব'লে ব্যাঙাচি জলের মধ্যেই শ্বাসকার্য চালাতে পারে। ক্রমে বাইরের ফুলকা মিলিয়ে গেল, সৃষ্টি হ'ল ভিতরের ফুলকা। তবে তার আগেই ছোট্ট একটু মুখ দেখা গেল, ব্যাঙাচি জলের ঘাসপাতা কুরে কুরে খেতে লাগল। এইভাবে বেশ কয়েক দিন চলে গেল। একটু বড় হলে, প্রথমে পেছনের দু'টো পা গজাল। দিন কয়েক পরে, সামনের আরও দু'টো পা গজাল! ক্রমে তার ফুসফুসও জন্মাল। এই অবস্থায় ব্যাঙাচি মাঝে মাঝেই জলের উপর ভেসে ওঠে, আর একটু শব্দ হলেই ডুব দেয়। এর মধ্যে লেজটা ক্রমশঃ ছোট হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেহেই মিলিয়ে গেল। এরপর একদিন ব্যাঙটা ডাঙায় উঠে এলো। ব্যাঙ তখন আর শিশু নয়, রীতিমতন বড় সড় একটি ব্যাঙ। বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আর পোকা-মাকড় ধ'রে ধ'রে খায়। আর মানুষ-জনের সাড়া পেলে, সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়।



সোনা ব্যাঙের জীবনকথা—ডিম থেকে জন্ম ও ক্রমবিকাশ।
1. ডিম ; 2-5. ব্যাঙাচির ক্রমবিকাশ ; 6. পূর্ণাঙ্গ সোনা ব্যাঙ।

মাস্টার মশাই বুঝিয়ে দিলেন, ব্যাঙ মেরুদণ্ডী প্রাণী। ব্যাঙের প্রথম জীবন কাটে জলে—তখন তার ব্যাঙাচি অবস্থা। এই সময় সে মাছের মতোই ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ ডাঙায় চরে বেড়ায়, কিন্তু সে জলেও থাকতে পারে, এবং অনায়াসে জলে সাঁতার কাটতে পারে। তবে তখন জলের উপরে নাক তুলে তাকে শ্বাস নিতে হয়। জলে-স্থলে প্রায় সমান গতি বলে ব্যাঙকে উভয়চর প্রাণী বলা হয়।



টিক্‌টিকি

সন্ধ্যার পর রুমকি যখন পড়তে বসে, তখন সামনের দেওয়ালে দু'টো টিক্‌টিকি ঘুরে বেড়ায়, আর পোকা-মাকড় ধ'রে ধ'রে খায়। রুমকি দেখল, টিক্‌টিকির আকৃতি সরু, লম্বা আর চ্যাপ্টা। দেহের তিনটি অংশ—মাথা, ধড় আর লেজ। মাথার গড়ন অনেকটা তেকোনা মতো। সামনে মুখের দিকটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। তবে চোয়াল দু'টো বেশ বড়, তাই টিক্‌টিকির মুখের হাঁ বেশ বড়। দু'টো চোয়ালেই অনেক ছোট ছোট দাঁত আছে। মুখের ঠিক পেছনেই ওপরের চোয়ালে দু'টো নাকের ছিদ্র। মাথার দু'পাশে দু'টো চোখ। চোখের তারা বেশ বড়। চোখের পেছনে একটু নীচের দিকে আছে কানের ছিদ্র।



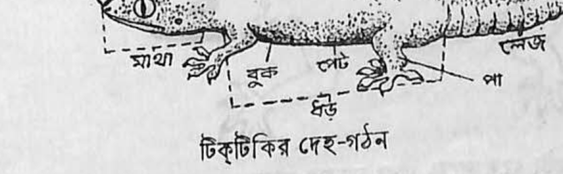
টিক্‌টিকি

বুক আর পেট নিয়ে যে অংশটা তৈরী, তাকে বলে ধড়। এই অংশ থেকেই দু'জোড়া পা বেরিয়েছে, দেহ থেকে বাইরের দিকে ছড়ানো। তাই এর বুক আর পেট দেওয়ালের খুব কাছাকাছি থাকে। টিক্‌টিকির প্রত্যেক পায়ে পাঁচটা ক'রে আঙুল, প্রত্যেক আঙুলে নখর আছে। এর লেজটা বেশ লম্বা, আর মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে।

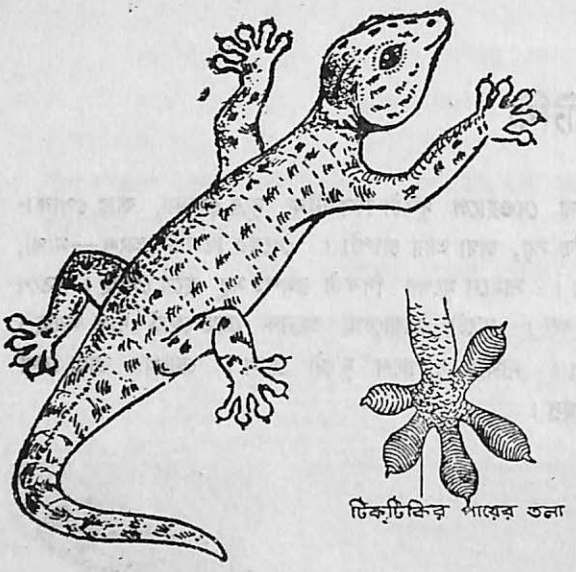
মাস্টার মশাই বললেন,—টিক্‌টিকি সরীসৃপ-জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণী। অন্যান্য সব সরীসৃপের মতো, টিক্‌টিকিরও সারা দেহ আঁশ দিয়ে ঢাকা। তবে আঁশগুলো খুব ছোট, তাই ভাল ক'রে লক্ষ্য না ক'রলে ঠিক বোঝা যায় না।

তিনি আরও বললেন,—টিক্‌টিকি ঘরের দেওয়ালে, এমন কি ঘরের ছাতের নীচের দিকে, কেমন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়, তা নিশ্চয় দেখেছো? মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আর কেউ এতো সহজে দেওয়ালে বা ছাতে এমনভাবে চলতে পারে না। টিক্‌টিকির পায়ের বিশেষ গঠনের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। এর পায়ের আঙুলের প্রান্তগুলি বেশ চওড়া এবং তার তলার দিকের চামড়ায় অনেক খাঁজ কাটা আছে। সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (বা, আতশী-কাচের) নীচে রাখলে দেখা যায়, এই খাঁজগুলোয় অসংখ্য খুব ছোট ছোট কাঁটার মতো আছে। এদের সাহায্যেই টিক্‌টিকি দেওয়ালের বা ছাতের সঙ্গে নিজেকে আটকে রাখতে পারে। সহজে পড়ে যায় না।

মাস্টার মশাই চলে গেলেন। রুমকি অবাক হয়ে দেখতে লাগল, টিক্‌টিকি কেমন ক'রে শিকার ধরে। রুমকি লক্ষ্য ক'রল, যখন কোনো পোকা-মাকড় দেওয়ালে এসে বসে, তখন টিক্‌টিকিটা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর নাগালের মধ্যে পেলেই, চকিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হাঁ ক'রে কপ্‌ ক'রে পোকাটা ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলে। মাঝে মাঝে সে আরশোলাও ধ'রে খায়। তবে কাজটা তত সহজ হয় না। আরশোলা দেখলেই খুব সন্তর্পণে গুটি গুটি সেই দিকে এগিয়ে



টিক্‌টিকির দেহ-গঠন



টিক্‌টিকির পায়ের তলা

টিক্‌টিকির পায়ের বিশেষ গঠন।

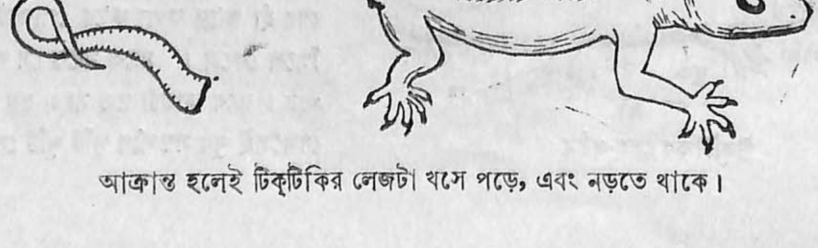
যায়। সুযোগ বুঝে হঠাৎ মুখ দিয়ে আরশোলাটা ধ'রে ফেলে এবং বারবার আছড়ে তাকে মেরে ফেলে। তারপর ধীরে-সুস্থে গিলে খায়।

টিক্‌টিকি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে 'টিক্‌-টিক্‌' শব্দ করে। ঝুমকির কি খেয়াল হ'ল, সে একদিন একটা টিক্‌টিকি ধরতে গেল। কিন্তু টিক্‌টিকির লেজটা খসে পড়ে গেল, আর লেজহীন টিক্‌টিকিটা দৌড়ে পালালো। এদিকে খসে-পড়া লেজটা তিড়িং তিড়িং ক'রে লাফাতে লাগল।

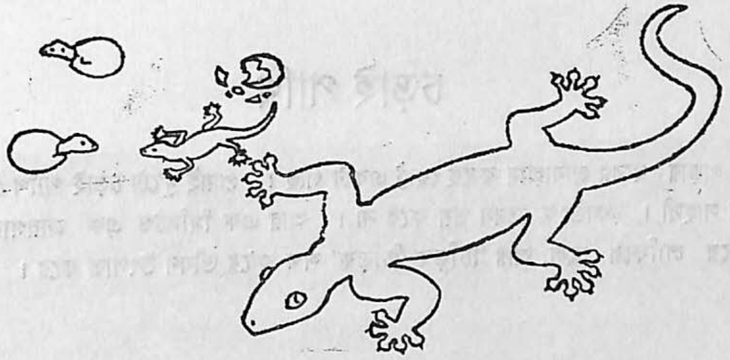
সেকথা শুনে মাস্টার মশাই বললেন,—এটা হ'ল টিক্‌টিকির আত্মরক্ষার একটা অদ্ভুত উপায়। আক্রান্ত হলেই এর লেজটা খসে পড়ে, এবং নড়তে থাকে। এজন্য সাময়িকভাবে আক্রমণকারীর দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়। আর সেই অবসরে টিক্‌টিকিটা দৌড়ে পালায়।


মাঝে মাঝে সে আরশোলাও ধ'রে খায়।

কয়েকদিন পরেই টিক্‌টিকিটা আবার সেখানে এলো। ঝুমকি অবাক হয়ে দেখল, ওর আবার একটা নতুন লেজ গজিয়েছে।


আক্রান্ত হলেই টিক্‌টিকির লেজটা খসে পড়ে, এবং নড়তে থাকে।

ঘরের কোণে ছোট্ট একটা কাগজের বাক্সে পুরণো কিছু চিঠিপত্র-কাগজ এইসব থাকে। টিক্‌টিকি দু'টো প্রায়ই সেখানে যায়। একদিন ঝুমকির কি মনে হ'ল, বাক্সের ডালাটা সরিয়ে ফেললো। দেখল, সেখানে ছোট



ওমা, সেকি! ক্ষুদে ক্ষুদে তিনটে টিক্‌টিকির ছানা ডাগর ডাগর চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ছোট সাদা তিনটে ডিম। ঝুমকি তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ ক'রে রেখে দিল। কয়েকদিন পরে ঝুমকি আবার বাক্সের ডালাটা সরাল। ওমা, সেকি! ক্ষুদে ক্ষুদে তিনটি টিক্‌টিকির ছানা ডাগর ডাগর চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে! তাদের আশেপাশে পড়ে আছে ডিমের খোলা।

আরও কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, ছানা তিনটি দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে পোকা-মাকড় খাচ্ছে।

চড়াই পাখি

সানির পড়ার ঘরের জানালার কাছে ছোট্ট একটা গাছ। প্রায়ই দু'টো চড়াই পাখি সেখানে আসে। এরা অত্যন্ত চঞ্চল, আর সাহসী। কাউকে তেমন ভয় করে না। আর এক মিনিটও এক জায়গায় স্থির থাকে না। সব সময়ই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, আর 'চিঁড়িক-চিঁড়িক' শব্দ ক'রে ভীষণ উৎপাত করে। প্রথম প্রথম সানি খুব



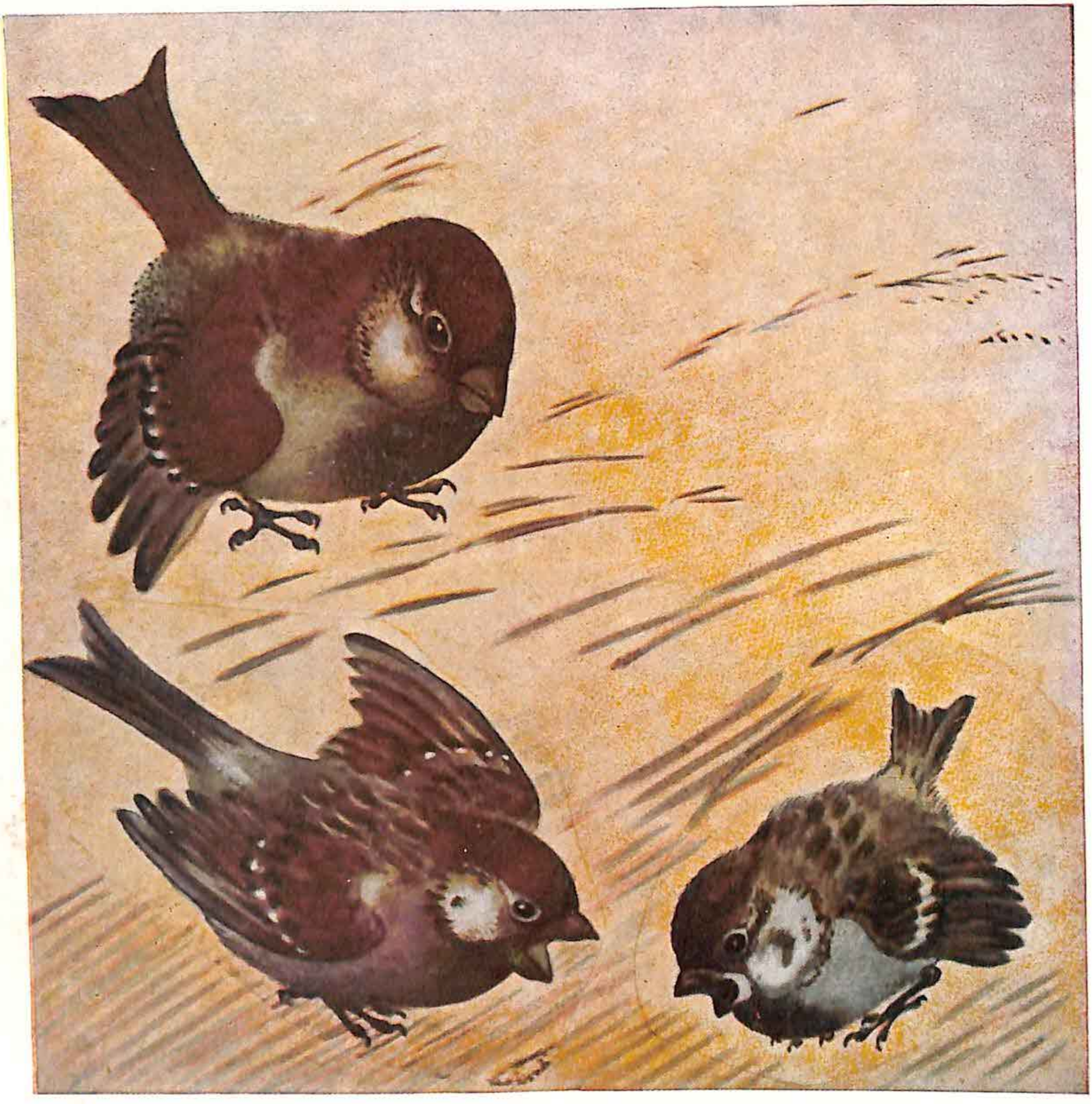
সানির পড়ার ঘরের জানালার কাছে ছোট্ট একটা গাছ। প্রায়ই দু'টো চড়াই পাখি সেখানে আসে।

বিরক্তি বোধ ক'রত। কিন্তু ক্রমশঃ এদের সম্পর্কে তার কৌতূহল একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগল। তাই একটু ধৈর্য সহকারে ক'দিন ধরে এদের লক্ষ্য করতে লাগল। এদের আকৃতি-প্রকৃতি কীরূপ, এরা কখন কী করে, কী খায়, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারল।

সানি দেখল, চড়াই পাখির এক জোড়া পাখা বা ডানা, আর একজোড়া পা। সারা দেহ পালক দিয়ে ঢাকা, আর পা আঁশ দিয়ে ঢাকা। ডানার পালক বেশ বড় এবং মজবুত। পাখা বা ডানার সাহায্যে এরা বেশ উড়তে পারে। আবার পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতেও পারে। পায়ে চারটি ক'রে আঙুল, আর তাতে নখর



মা এসে ডাক দিল,—'চিড়িক্-চিক্', 'চিক্-চিক্' !
সবগুলো ছানা একসঙ্গে হাঁ ক'রে গলা বাড়িয়ে দিল ।

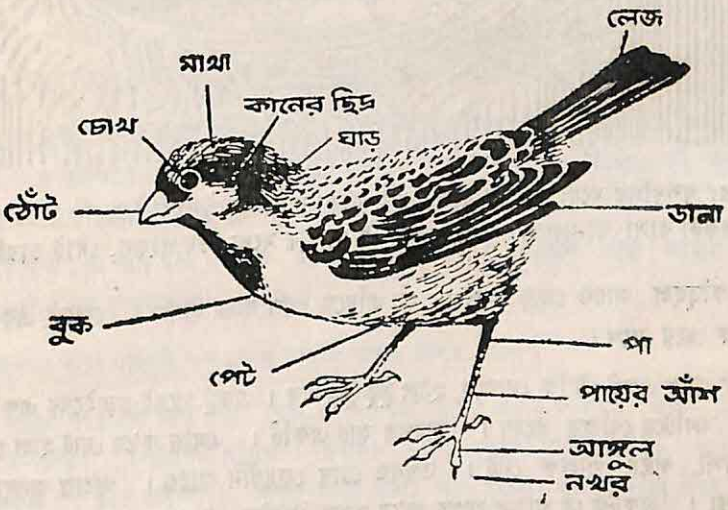


মা ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল,–'ওরে যাসনি, যাসনি, বাছা আমার !
এখনি পড়ে যাবি ধপ্ ক'রে, আর হুলোটা খেয়ে ফেলবে গপ্ ক'রে !'

আছে। পায়ের তিনটি আঙ্গুল সামনের দিকে এবং একটি পিছনে থাকে বলে এরা গাছের ডাল আঁকড়ে ধ'রে সেখানে বসে থাকতে পারে।

এর ঠোঁট বেশ শক্ত ও মোটা। ঠোঁটের সাহায্যে এরা শস্য খুঁটে খায়। নানারকম শস্য ও ঘাসের বীজ এদের প্রধান খাদ্য। ছোট ছোট পোকা-মাকড়ও এদের প্রিয় খাদ্য।

সানি লক্ষ্য ক'রল, চড়াই দু'টো দু'রকম। মাস্টার মশাই বললেন,—এদের একটি পুরুষ-চড়াই, অন্যটি স্ত্রী-চড়াই। তাই এদের চেহারা ঠিক একরকম নয়। পুরুষ-পাখির গাল ও গলার দু'পাশের রং সাদা, কিন্তু ঠোঁটের নীচেই গলার উপরের দিকের খানিকটা জায়গা কালো। মাথার ও ঘাড়ের উপরের দিকটা ছাই রঙের। ডানা ও লেজের রং গাঢ় বাদামী, তার ওপর কালো কালো ডোরা কাটা। স্ত্রী-পাখির ঠোঁটের নীচে গলার রং সাদা।



চড়াই পাখির দেহ-গঠন।

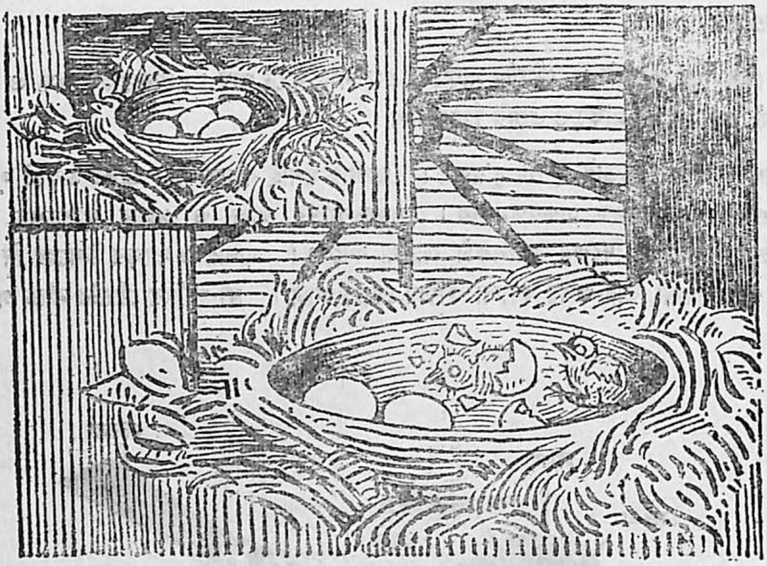
মাথার উপরের অংশ এবং ঘাড়ের রং হালকা বাদামী। ডানা আর লেজের রঙও হালকা বাদামী, তার ওপর কালো কালো ডোরা।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ওরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের ঘুলঘুলির মধ্যে শুকনো ঘাস, খড়, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর একটা বাসা বানাল।

সানির মা বললেন,—'চড়াই পাখি তাড়াসনি। চড়াই পাখি ঘরে থাকা ভাল। তাতে গৃহস্থের কল্যাণ হয়।'

চড়াই পাখি তাড়ালে অমঙ্গল হবে, এই ভেবে, সানি ওদের কিছু বলল না। ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে লাগল।

স্ত্রী-চড়াই ঐ বাসার মধ্যে ডিম পাড়ল, মোট চারটি। তারপর কিছুদিন ধরে ডিমে তা দিল।



ঘরের ঘুলঘুলির মধ্যে শুকনো ঘাস, খড়, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর একটা বাসা বানাল। ...স্ত্রী-চড়াই ঐ বাসার মধ্যে ডিম পাড়ল, মোট চারটি।

সানির কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। সে এদিকে বেশ নজর রাখল। রোজই একবার ক'রে টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে।

কয়েকদিন বাদে একটু উঁকি মেরেছে, হঠাৎ ঠুক্-ঠুক্ শব্দ। একটু পরেই চড়াইয়ের একটি ছানা নিজেই ঠোঁট দিয়ে ডিমের খোল ফাটিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর আর একটি। এমনি ক'রে মোট হ'ল চারটি। ছানাগুলো সব লালচে গোলাপী, গায়ে পালক নেই। তখনও চোখ ফোটেনি কারও। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় জড়াজড়ি ক'রে পড়ে রইল তারা। একটুকু যে খাবার সংগ্রহ ক'রে খাবে, সেইটুকু ক্ষমতাও তাদের নেই। এদিকে মা-চড়াই আর বাবা-চড়াই তখন খুব ব্যস্ত। ছানাগুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা তাদের খাবার-দাবার ও যত্নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাবা-চড়াই ঠোঁটে ক'রে একটা পোকা এনে ডাক দিল,—'চিড়িক-পিড়িক'।

সঙ্গে সঙ্গে মা-ও ডাক দিল,—'চিড়িক-চিক্', 'চিক্-চিক্'।

সবগুলো ছানা একসঙ্গে হাঁ ক'রে গলা বাড়িয়ে দিল। একটার মুখে পোকাটা গুঁজে দিতেই সে এক ঢোকে পোকাটা গিলে ফেললো।

এমনি ক'রে মা-চড়াই আর বাবা-চড়াই যতবার খাবার নিয়ে আসছে, ততবারই তারা সেগুলো রাক্ষসের মতো গিলছে। মা কিংবা বাবা যে কেউ খাবার নিয়ে এলেই সবগুলো ছানা বিরাট হাঁ ক'রে আকাশের দিকে গলা উঁচিয়ে দেয়। তখন সে একটার মুখে খাবার গুঁজে দেয়, আর মুখে কিছু যাওয়া মাত্রই ছানাটি গলা নামিয়ে নেয়।

ছানাগুলো এইভাবে খায় আর দিন দিন আকারে বড় হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের গায়ে পালক দেখা দিল, চোখ ফুটল। আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল, ছানা ক'টি দিব্যি চড়াই পাখি সেজে বাসার ধারে বসে রয়েছে। ওরা কেউই তখনও উড়তে শেখে নি, তবে ডানা দু'টো বেশ নাড়াচাড়া করতে পারে।



চড়াইয়ের একটি ছানা নিজেই ঠোঁট দিয়ে ডিমের খোল ফাটিয়ে বেরিয়ে এলো। ...কয়েকদিনেয় মধ্যেই তার গায়ে পালক দেখা দিল; চোখ ফুটল।

একটা ছানা একটু বেশী সাহসী, ডানপিটে। বাসা থেকে মাথা বের ক'রে সে উঁকি দিল। গোল গোল চোখে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছে,—'আহা, কী সুন্দর এই পৃথিবী!' মনের আনন্দে সে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিল।

'চিঁড়িক-চিঁড়িক', মা ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—'ওরে যাসনি, যাসনি, বাছা আমার! এখনি পড়ে যাবি ধপ্ ক'রে, আর হুলোটা খেয়ে ফেলবে গপ্ ক'রে।'

মায়ের চীৎকার শুনে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে আবার বাসায় ফিরে এলো।

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন চলে গেল। এইবার তাদের ওড়ার পালা। এজন্য মা-বাবার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। 'চিঁড়িক-চিঁড়িক', পিঁড়িক-পিঁড়িক'—কখনও দূরের গাছে বসে ডাকছে, কখনও কাছে এসে কিছু বলছে। কিন্তু বাচ্চারা সব ভয়ে জড়সড়। একটু-আধটু ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে, বাসার ধারে গিয়ে উঁকি মারছে, কিন্তু কেউই সাহস ক'রে বাসা ছেড়ে যাচ্ছে না।

বাবা-পাখি হঠাৎ একটা ছানাকে ঠেলে ফেলে দিল—ফুরুৎ। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে বাসা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অজানা আকাশে। নিজের সাধ্যমত উড়তে আরম্ভ ক'রে দিল। তার বাবা-মাও তার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললো।

ছানাটি প্রাণপণে ডানা ঝাপ্‌টে একেবারে আনাড়ির মতো উড়তে লাগল। তারপর কোন প্রকারে বাগানের পাঁচিলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

বাবা-মা এতেই খুশী হয়ে একসঙ্গে বাহবা দিয়ে বলে উঠল,—'বাঃ, সাবাস! এইতো চাই। বাহাদুর বটে!'

ফুরুৎ, ফুরুৎ, ফুরুৎ—বাকি ছানা তিনটিও একে একে উড়ে এসে পাঁচিলে বসল। তখন তাদের আনন্দ দেখে কে! সবাই মিলে হাঁক-ডাক শুরু ক'রে দিল। এই বাগানে নামছে, পাঁচিলে উঠছে, এই ডালে বসছে। চারিদিকে 'চিঁড়িক-চিঁড়িক', 'পিঁড়িক-পিঁড়িক', 'চিক্-চিক্' আওয়াজ। তাদের সঙ্গে তাল রাখতে মা-বাবার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওদের হাঁক-ডাক শুনে, বাড়ির হুলো বেড়ালটা গুটি গুটি সেখানে এসে ওত পেতে বসল। সাদায়-কালোয় গা, পাঙাশ চোখ। থাবা চাটছে, আর লেজ নাড়ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর মাঝে মাঝে 'মিঁয়াও-মিঁয়াও'

ক'রে বলছে,—'আহা-হা, কী খাসা চড়াই-ছানা রে ! আর একটু কাছে এলেই হয়, তখন খপ্ ক'রে ধ'রে গপ্ ক'রে গিলে ফেলবো ।'

দারুণ লোভে তার চোখ দু'টো চক্‌চক্ করছে, আর জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে ।

একটু পরেই হঠাৎ চিঁ-চিঁ শব্দ । বেড়ালটা খপ্ ক'রে একটা ছানা ধ'রে তাকে মুখে নিয়ে দৌড় দিল ।

চড়াইয়ের মা-ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল তার পেছন-পেছন । সে তখন ভয়ংকরী, দুঃসাহসী । ঠোঁট ফাঁক ক'রে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে, ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে, আর সুযোগ পেলেই মরীয়া হয়ে বেড়ালের মাথায় ঠুকরে দিচ্ছে ।

রাগে গর্‌গর্ ক'রে বেড়ালটা হেঁকে উঠল,—'অ্যাই, খবরদার ! দূর হ ! না হলে তোর বাচ্চার যে দশা হয়েছে, তোরও সেই দশা ক'রে ছাড়ব ।' এই বলে, সজোরে থাবা মারল, তারপর সেখান থেকে দৌড়ে পালালো ।

মা-পাখিটা কোন প্রকারে তার নাগালের বাইরে উড়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো । কিন্তু তার লেজের কয়েকটা পালক খসে পড়ল । উঃ ! খুব অল্পের জন্যে সে রক্ষা পেল !

ওরা তখন আর কী করে ! সবাই মিলে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচামেচি-কান্নাকাটি ক'রল । তারপর একে একে আবার বাসায় ফিরে এলো ।

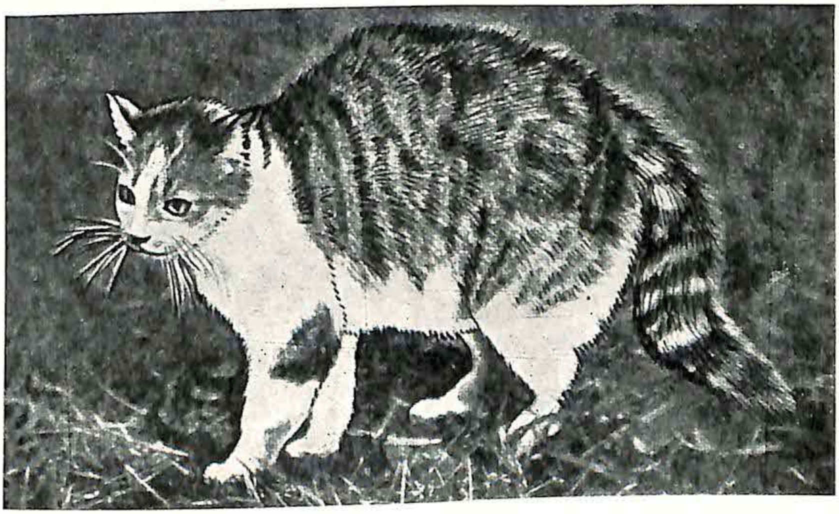
ওড়ার প্রথম দিনই একটা ছানা কমে গেল । এজন্য ওদের দুঃখের সীমা রইল না । কিন্তু এই অভিজ্ঞতা থেকে ছানারা বুঝল, এমনি অনেক আপদ-বিপদ পার হয়ে তাদের বড় হতে হবে । তবে আপদে-বিপদে মা-বাবাই সাধ্যমত তাদের রক্ষা ক'রবে । সুতরাং, বেঁচে থাকার কায়দা-কানুন ওদের কাছ থেকেই তাদের শিখে নিতে হবে ।

উঃ ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার ! সব দেখে-শুনে সানিরও খুব কষ্ট হ'ল । সেও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রল, জীবনে চলার পথে এইরকম বাধা-বিপত্তি অনেক থাকে । তাই সব সময় অত্যন্ত সাবধানে চলতে হয়, নতুবা তার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর !

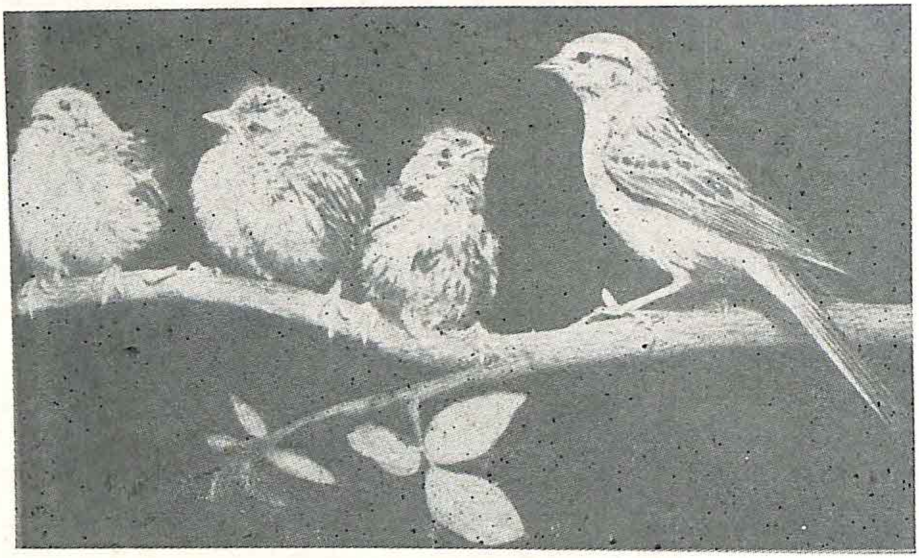




ছানাটি প্রাণপণে ডানা ঝাপ্‌টে একেবারে আনাড়ির মতো উড়তে লাগল



ওদের হাঁক-ডাক শুনে, বাড়ির হুলো বেড়ালটা গুটি গুটি
সেখানে এসে ওত পেতে বসল।



ওড়ার প্রথম দিনই একটা ছানা কমে গেল।
এজন্য ওদের দুঃখের সীমা রইল না।



উঃ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! সব দেখে-শুনে সানিরও খুব কষ্ট হ'ল।

উৎসর্গ

স্নেহের

অনিতা, নন্দিতা ও রীতা,

নানাকারণে লেখার কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। তোমাদের আগ্রহাতিশয্যে আবার লেখার জগতে ফিরে এলাম। তাই আমার এই ছোট্ট বইখানি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

—মেসোমশাই

প্রকাশক—শ্রীসুমন্ত রায়
৩৮/এ, ব্লক-বি
নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৫৩

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য—৬ টাকা

প্রচ্ছদ সজ্জা—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

অঙ্গ সজ্জা—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
এবং
শ্রীশিবেন গুহ

মুদ্রণ—শ্রীসুধেন্দু বাগচী
গুপ্ত প্রেশ
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীভোলানাথ রায়
৯৩/২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯